



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 864 - 868

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

তুকখা গানের প্রচার ও প্রসারে ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

রাজেশ রায়

স্বাধীন গবেষক, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

Email ID: rajeshroy.set@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Tukkha Song,
folk culture,
Rajbanshi,
Maynaguri.

Abstract

Maynaguri block of Jalpaiguri district is a very ancient region. Geographically and historically Maynaguri is significant, and it equally important in terms of folk culture and folk literature. Just as the Teesta, Jarda, and Jaldhaka rivers have flowed through Maynaguri from ages, so some of the region's folk songs have been passed down through the generations. Bhawaiya, Mecheni songs, Bishahari songs, Chorchunni, Satyapir songs, Gamira dance and songs, Baul songs, and Palatiya songs are all prevalent among the people of Maynaguri. Similarly, the popular Tukkha songs of the Rajbanshi community are also noteworthy. These Tukkha songs were primarily prevalent among the people of the Rajbanshi community. There was a close connection between Tantric practices and Tukkha songs. Although the prevalence and spread of these Tukkha songs are not very noticeable today at maynaguri. These can still be heard in the voices of elderly members of the Rajbanshi community in remote villages of maynaguri. In this article, we will attempt to highlight the history, tradition, and spreading of Tukkha songs.

Discussion

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি অঞ্চল হল এক অতি প্রাচীন জনপদ। ময়নাগুড়ি উত্তরে লাটাগুড়ি, গুরুমারা জাতীয় উদ্যান, পূর্বে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা, পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা ও দক্ষিণে মেখলিগঞ্জ ও ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। অতীতে ময়নাগুড়ি ভুটান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জানা যায়। ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি শহরকে জেলা হিসেবে গঠন করা হলে ময়নাগুড়ি অঞ্চল জলপাইগুড়ি জেলার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। আনুমানিক ১৮৮৩ সালের পর ময়নাগুড়িতে থানা প্রতিষ্ঠা হলে ময়নাগুড়ি শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ পায়। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে ময়নাগুড়ি অঞ্চল যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের দিক থেকে সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বোঝায় রেখেছে। তিস্তা, জর্দা, জলঢাকা নদী যেমন যুগ যুগ ধরে ময়নাগুড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ঠিক তেমনি এই অঞ্চলের কিছু লোকগান যুগ যুগ ধরে জনমানুষে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ভাওয়াইয়া, মেছেনী গান, বিষহরি গান, মন শিক্ষা, চোরচুন্নি, সত্যপীরের গান, গমীরা নাচ গান, বাউল গান, পালাটিয়া গান, যেমন- ময়নাগুড়ি জন মানুষে প্রচলিত। ঠিক তেমনি রাজবংশী সমাজের জনপ্রিয় তুকখা গানও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এই তুকখা গান মূলত রাজবংশী সমাজের মানুষের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। তন্ত্রসাধনার সাথে তুক্ষা গানের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এই তুক্ষা গানগুলি ময়নাগুড়ির বাইরে কোচবিহার, আসাম,

বিহার, নেপাল ও বাংলাদেশের কিছু অংশে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ছিল। ময়নাগুড়ি অঞ্চলে এই তুফা গানের প্রচার ও প্রসার তেমন একটা চোখে না পড়লেও এখনো গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজবংশী সমাজের প্রবীণ নাগরিকদের গলায় তুফা গানগুলি বেজে উঠে। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় একটু আনন্দ বিনোদনের জন্য তুফা গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকে মনের শান্তির খোঁজে।

তুফা কথার অর্থ হল তথ্য। মানুষের মনের আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনাগুলো গানের মাধ্যমে তুলে ধরাই হল মূল উদ্দেশ্য। মেচ ভাষায় তুফাকে থুফা বলা হয়। দেহতত্ত্ব, মনোশিক্ষা, আসপালি, গুরু শিষ্যের ডেরায় এই গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকে। শিষ্য যখন গুরুকে কোন প্রশ্ন করে তখন গুরু তা গানের মাধ্যমে উত্তর দেয়। এই তুফা গানগুলি তন্ত্রসাধনা, তান্ত্রিক বৌদ্ধ, সহজিয়া, নাথপাঙ্ক ইত্যাদি ভাবধারার সঙ্গে মিশে যায়। পরবর্তীকালে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানে এই তুফা গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকে। একসময় একাদশী ব্রত পালনের সময় সারারাত ধরে তুফা গানের আসল বসত। ডক্টর চারুচন্দ্র সান্যাল ‘দি রাজবংশীস অফ নর্থ বেঙ্গল’ গ্রন্থে তুফা গানকে ‘ডোম্বীর গান’ বলেছেন।

তুফা গানের পূর্বে রাজবংশী সমাজের পূর্বপুরুষরা মোটাছলি নামে এক প্রকার গান গাইতো। এই মোটাছলি গান ছিল খুব রসিকতা ও অঙ্গীল ভাষার গান। এই মোটাছলি গান গাওয়া হত বাড়ির বাইরে কোন নির্জন জায়গায় বা দোহলা বাড়িতে। এই সব গান মহিলাদের শোনা বারণ ছিল। তাই রাজবংশী পূর্বপুরুষরা এই মোটাছলি গান বাদ দিয়ে সমাজকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য দেহের ও মনের কথা তথ্যের আকারে প্রকাশ করার জন্য তুফা গান গাইতে লাগলেন। রাজবংশী পূর্বপুরুষরা প্রথম দিকে সারিঞ্জা (যুগী যন্ত্র) মাধ্যমে গলার সুর মিলিয়ে তুফা গান করত। সাথে খমক (ঘকোমোকো), খঞ্জনি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য নিত। বর্তমানে রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে হারমোনিয়াম, দোতারা, ঢোল ও খেলের সাহায্যে তুফা গানগুলি গাওয়া হয়।

তুফা গান কত প্রাচীন তা বলা খুবই কঠিন। বাউল গানের সাথে তুফা গানের কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গি গত মিল থাকলেও পরবর্তীকালে বাউল গান চলে গেল মনের মানুষের খোঁজে আর তুফা গান রয়ে গেল শরীর সাধনায়। সেই হিসেবে বঙ্গরত্ন প্রাপক, লোক সাহিত্যের গবেষক দীনেশ রায় তার বিভিন্ন প্রবন্ধে দাবি করেন যে, বাউল গানের অনেক পূর্বে তুফা গানের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত বৈষ্ণবায়নের পর তুফা গানের বৃহৎ অংশ বৈষ্ণব ধারায় মিশে গেছে। অতীতে গোসাই মাতাজিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সারিঞ্জা বাজিয়ে তুফা গান করে ভিক্ষা করত। বর্তমানে এই ধরনের গোসাই মাতাজির গলায় গানের মুহূর্ত চোখে পড়ে না। তুফা গানের গায়ক ঢালা গোসাই (৭৬) তাঁর কাছ থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি ২৫ বছর বয়স থেকে এই তুফা গানগুলি গেয়ে চলেছেন। তাঁর শিষ্য তুলোবালা বজ্রবাসী (৬৪) এখনো সারিঞ্জা বাজিয়ে গান করেন। এনাদের গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নিম্নে গানগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

গরান :

“বারোটা বাজিয়া দুইটারে হইলো
ও তোর সময় চলিয়া যায়
ওহোরে এলাও কি তোর পাপ দেহাটা
ঘষা মানজা না হয়।”

চিতান :

“সাধুর বাজার বাজাররে, সাধুর বাজারটা খিচিরি মিশল
কাহো করেছে হরিবল হরিবল, কাহা করেছে গন্ডগোল
কাহো কাহো ভাবোতে পাগোল।”

চিতান :

“সাধুর বাজার বাজাররে, সাধুর বাজারটা কোলিকাতার শহর,
কোলিকাতার শোহর রাস্তারে মেলা,

কত চতুর হারাইসে দিশা
দিশা হারেয়া বেড়াছেরে কান্দিয়া।”

গানটির মর্মার্থ হল, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক অনুষ্ঠান শুরুর সময় মূল গিদাল দেখল যে, তার বাকি সহশিল্পীরা এসে উপস্থিত হয় নাই। সেই কারণে সময় মতো পূজা অর্চনা ও গান-বাজনা করা যাচ্ছে না। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে বাকি গিদালের অপেক্ষায়। দুপুর থেকে বিকাল হতে চলল এখনো তারা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। হরি যে একমাত্র সম্ভব তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। অন্য দৃষ্টিতে বলতে গেলে জীবনের তিনকাল গিয়ে শেষকালে পৌঁছালেও অনেকে হরিনাম জপ করেন না। গুরু ভক্তি নেই তাদের মধ্যে। আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার কথা কেউ ভাবেন না।

গানের দ্বিতীয় চরণে বলা হয়েছে, এই ভব সংসার ভালো-মন্দ মানুষের অভাব নেই। কেউ কেউ গুরু গুরু করে পাগল আর কেউ হরির মাহাত্ম্য এখনো বুঝে উঠল না। তাই তারা সমাজের মূল স্রোত থেকে বেরিয়ে খারাপ কাজের সাথে যুক্ত।

গানের তৃতীয় চরণে বলা হচ্ছে, এই সংসারকে কলকাতার মতো বড় শহরের সাথে তুলনা করেছেন। কলকাতা শহরে যেমন কুল-কিনারা কিছুই নেই, ঠিক তেমনি মানুষ জীবনে এই লীলা খেলার কুল-কিনারা কিছুই নেই। যে জীবনের আসল মাহাত্ম্য বুঝতে না পারে, তাঁর রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়ানোর মতো পরিস্থিতি হয়। অন্য দৃষ্টিতে বলা যায় যে, জীবনে সঠিক গুরু না পেলে অন্ধকারময় জগতে বসবাস করতে হয়।

গরান :

“সাধনো না জানিহে দয়াল, ভজনো না জানি
কিদিয়া পূজিবো চরন, রাঙাচরণ খানি”

চিতান :

“তোমার মন্ত্র তুমি হে জানো, হে দয়াল
উপলক্ষ আমি।”

গরান :

“বহু জন্মের অপরাধী হে দয়াল
ক্ষমা করো তুমি।”

গানটির সরলার্থ হচ্ছে, এই যে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে হরিনাম গাইছি তাতে কতটা হরি ভক্তি আমার মনে আছে তা আমার ঠিক জানা নেই। এই ভবের সংসারে কতদিন আছি তাও ঠিক জানি না। শুধু যে বেঁচে থাকার জন্য হরিনাম গাইছি তাও না, পরজন্মের কথা ভেবেও হরিনাম গাইছি। হরিকে কিভাবে পূজা দিলে সন্তুষ্ট হবেন তাও ঠিক জানি না। এই জীবনে কত পাপ-পূর্ণ করলাম তার হিসাবও ঠিক জানি না। যদি পারো ক্ষমা করে দিও হে হরি। এখানে গুরু ভক্তির কথা বলা হয়েছে। জীবনে যতগুলো পাপ করা হয়েছে তা গুরুকে জানিয়ে গুরুর কাছে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে।

তুকখ্যা গানের দুটি দলের মধ্যে যখন গানের লড়াই চলতো, তখন তাকে বলতো ক্ষাপার গান। গুরু শিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে তথ্যগুলো উঠে আসতো সেগুলি শরীর ও মনের আত্মতুষ্টির সন্তুষ্টি যোগাতো। এই ক্ষাপা গানগুলি স্থান বিশেষে খ্যাঁচেরা বা ক্ষাপা গান নামে পরিচিত। এই ক্ষাপার গান হল তুকখ্যা গানের একটি রসিকতার অংশ। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ-তেরিশ বছর আগে রাজবংশী সমাজের বয়স্ক মানুষদের মুখে ক্ষাপার গান শোনা যেত। বর্তমানে ময়নাগুড়ি ব্লকে ক্ষাপা গানের প্রচার-প্রসার তেমন একটা চোখে পড়ে না। এটা হয়তো যুগোপযোগী কিছু আধুনিক ভাষার গানের প্রভাবে বিলুপ্তির পথে। তবে তুকখ্যা গানগুলো এখনো গ্রাম বাংলার বয়স্ক মানুষদের মুখে শোনা যায়।

তুকখ্যা ও ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী দীপ্তি রায়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া সুবাদে জানতে পারি যে, তিনি ২০০৩ সালে তুকখ্যা গানগুলি একটি সরকারি চ্যানেলে রেকর্ড বন্ধ করেন। ডিডি বাংলা, তারা টিভি, আকাশ বাংলার মতো চ্যানেলে তাঁর গাওয়া গানগুলি সম্প্রচার করা হত। বর্তমানে তাদের একটি তুকখ্যা একাডেমি অফ পারফর্মিং আর্ট বলে প্রতিষ্ঠানও আছে।

দীপ্তি রায় ও তার সহশিল্পীরা মিলে রাজবংশী সমাজের এই তুচ্ছ গানগুলি প্রচারের আয়োজন করার জন্য এখনো নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তরুণ প্রজন্মের অনেক রাজবংশী ছেলেমেয়েরা তুচ্ছ গান শেখার প্রতি আগ্রহ দিয়েছেন যা শিল্পী দীপ্তি রায়ের কথায় জানতে পারি। নিম্নে একটি গানের অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করলাম —

“বিখের মূলেতে ধারা নোধী
উজান পাখে সোদ চলে
হিমন বিরখো হরিহর
সিজিলেক কি বাদে।”^২

এই গানের অংশে বলা হচ্ছে যে, মানুষের শরীর বৃক্ষ বা গাছের মতো। গাছের কাণ্ড, প্রকাণ্ড, শিরা উপশিরার মতো মানুষের রক্তের শিরা উপশিরা বয়ে চলেছে নদীর স্রোতের মতো। হরিহর কি কারণে এই মানুষের শরীর বা বৃক্ষ তৈরি করেছেন তা জানা নেই।

শিল্পী নিতানন্দ রায় ও চিন্তা মোহন রায় কাছ থেকে জানতে পারি যে, বংশ পরম্পরায় তারা এই গানগুলো করে এসেছেন। বর্তমানে তারা বিভিন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে গানগুলি গিয়ে গেয়ে থাকেন। মানব শরীরের চারটি দেশ যেমন স্থূল, পার্বত্য, সাধক, সিদ্ধি আর ইঙ্গলা, পিঙ্গলা মধ্য দিয়ে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে মানব শরীরে। এই বিষয়বস্তুগুলো গানের মাধ্যমে তথ্যের আকারে বর্ণনা করা হয়। দেহের মধ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী কোথায় আছে এবং মানবদেহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত সে বিষয়ে গুরু তাঁর শিষ্যদের বোঝান। কিন্তু গানের ভাষার কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। এটা হয়তো রাজবংশী ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে সর্বসাধারণের কাছে যেন বোধগম্য হয় সেজন্যই হয়তো গানের ভাষার পরিবর্তন এসেছে। যদিও বিষয়টি উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

আরেকটি গান হল —

“ওরে এই হরির নাম পস্তুর সম্বল
আর সকলি মিছারে
ওরে উড়িয়া যাবে পবন পাখি
পড়িয়া নোবে দেহ।”^৩

গানটির অর্থ হল - একজন গায়ক অপর একজন গায়ককে গানের মাধ্যমে বলছে যে, বৃদ্ধ বয়সে এই ভবের সংসারে হরিনামেই একমাত্র সম্বল। বাকি সব মোহ মায়া। যেদিন চোখদুটো বন্ধ হয়ে যাবে, শরীরে প্রাণবায়ু ছেড়ে চলে যাবে, সেদিন সাথে আর কেউ যাবে না। শুধু পরে রবে এই মানুষরূপী দেহটা।

বর্তমান প্রজন্মের শিল্পী অনিন্দিতা রায়ের কাছে গান শোনার সুবাদে যে গানগুলো রেকর্ড বন্ধ করেছি তা নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

“তুই মোক পার কোরিয়াদে, পাড়ে নাইয়ারে,
ও কি ও নাইয়ারে,
আমিতো না জানি নাইয়া
ঘাটে নাগে আরো কড়ি
সাকাল-সাকাল পার করিয়া দে
হোবো দেশান্তরী নাইয়ারে।”^৪

গানটির অর্থ হল - গানটির সরলার্থ হচ্ছে, মানুষের মৃত্যুর পর পরকালে যাওয়ার জন্য যে হরিনাম প্রয়োজন, সে কথা কারো মনে থাকে না। এ জগতের মোহ মায়ায় সকলি পাগল। শরীর ও মনের সাধনাই হচ্ছে আসল সাধনা।

আমার ব্যক্তিগত মতে তুখুয়া গান নিয়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়ে, তুখুয়া গানের শিল্পীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া সুবাদে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, এরূপ লোকনাট্যধর্মী গানগুলো শুধুমাত্র রাজবংশী সমাজের বয়স্ক মানুষদের মধ্যে গানগুলো সীমাবদ্ধ। তবে বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের কিছু শিল্পী তুখুয়া গানগুলো গাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু গানের ভাষার কিছুটা আধুনিকীকরণ ঘটে চলেছে। রাজবংশী ভাষায় লেখা তুখুয়া গানের ছন্দ ও সুরের যে পরিবর্তন দিন দিন ঘটে চলেছে সেদিকেও লক্ষ রাখা প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিক জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে তথ্যের আকারে প্রকাশ করা এবং দেহ ও মনের আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার প্রতি মনোনিবেশ করে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষজনকে মূলস্রোতে ফিরে আনার যে প্রয়াস তা এই তুখুয়া গানগুলোতে ভেসে ওঠে।

Reference:

১. নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদনা), প্রবহমান বাংলা চর্চা-৫, নির্বাচিত গবেষণাধীন প্রবন্ধ সংকলন, শরণ ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০২১, পৃ. ৭৬৪
২. মণ্ডল, ধারা, ড. কাকলী (সম্পাদনা), বাংলা লোকসংগীত কোষ, অমর ভারতী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৪১-৩৫০
৩. YouTube link: <https://www.youtube.com/watch?v=jAZy7fNpjjc>
৪. YouTube link: <https://www.youtube.com/watch?v=jAZy7fNpjjc>

Bibliography:

- সুর, ড. অতুল, বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, চতুর্থ সংস্করণ, কার্তিক ১৪১৫ নভেম্বর, ২০০৮
পাল, হরিশচন্দ্র, (সংকলন), উত্তর বাংলার পল্লীগীতি, চটকা খণ্ড, ১৩৮১, সুনিতি রোড কোচবিহার।
রায়, কুমার, দীপক, হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, প্রকাশক - প্রদীপ কর, বাঁকুড়া।
সাপ্তাহিক বর্তমান, বর্ষ - ২০০৪, সংখ্যা ৩৮, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০০২
মণ্ডল, ধারা, ড. কাকলী (সম্পাদনা), বাংলা লোকসংগীত কোষ, অমর ভারতী, কলকাতা, ২০১৩

Acknowledgement:

- দিনেশ রায়, বঙ্গরত্ন প্রাপক, লোক সাহিত্যের গবেষক, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তাং ১৩.০১.২০২৬
দীপ্তি রায়, তুখুয়া ও ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী, তাং ২৭.০১.২০২৬
চিন্তামোহন রায়, সিঙ্গিমারি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তাং ২৩.১১.২০২৫
অনিন্দিতা রায়, ময়নামাপাড়া, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তাং ২৭.০১.২০২৬
নিত্যানন্দ রায়, সিঙ্গিমারী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তাং ১৭.১১.২০২৫
ঢালা গোসাই, কাজলদীঘি, রামসাই, জলপাইগুড়ি, তাং ২৫.০১.২০২৬
সুমিত্রা রায়, ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তাং.২০.০১.২০২৬
সতীশ রায়, বেংকান্দি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তাং ২১.১২.২০২৫
অবিরাম রায়, বেংকান্দি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তাং ২১.১২.২০২৫
তুলোবালা বজ্রবাসী, চেংমারী, রামসাই, জলপাইগুড়ি, তাং ১০.০১.২০২৬